৩০-৯-১৬ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে সেই পঠন-পাঠনই করছো, যেই পাঠের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মতনই রাজকুমার হতে পারা যায়। যেহেতু তোমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।"

প্রশ্ন :- বাবা(শিব) যখন 'ভগবান উবাচঃ' - শব্দ বলেন, তখন কোনও কোনও বাচ্চার মুখ মলিন হয়ে শুকিয়ে যায় - কিন্তু কেন ?

উত্তর :- যেহেতু ভগবান গুপ্তরূপে থাকেন, তাই সেই বাচ্চারা ভাবে বোধহয় এই দাদা-ই (ব্রহ্মাবাবাই) ভগবান উবাচঃ বলছেন। কিন্তু, নিরাকার ভগবানের কথা বলার জন্য তো অবশ্যই কারও মুখের প্রয়োজন। বাবা তাই বলেন, এটা অবশ্যই খুবই আশ্চর্যজনক, অথচ তা বোঝারও ব্যাপার আছে, আমি কিভাবে এঁনার শরীরে প্রবেশ করে, তোমাদেরকে এই পাঠ পড়াই।

ওঁম্ শান্তি! ভগবানুবাচঃ। এর মাধ্যমে ভগবান কি জানাচ্ছেন ? এই ভগবানুবাচঃ শব্দটি কে বললেন? কোই, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। আবার মানুষকেও তো আর ভগবান বলা যায় না। কেউ কেউ ভাববে, 'ভগবানুবাচঃ'- এই শব্দ যার বলার তিনিই বলছেন। কিন্তু তা যে নিরাকার ভগবান বলছেন, তা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। আবার তোমাদের সামনে ইনি কে বসে আছেন? তবে এখানে ভগবান কোথায়? এটাই তো নতুন ধরণের কথা, যার দরুণ মানুষ ধন্দে পড়ে নিরাশ হয়ে যায়। কিন্তু এটাও আবার সঠিক যে, অবশ্যই তা ভগবান-ই বলছেন। উনি স্বয়ং বলছেন, "আমিই বাচ্চাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিই । নর থেকে নারায়ণ বা কৃষ্ণে, নারীকে লক্ষ্মী বা রাধায় পরিণত করার লক্ষ্যে যোগ আর জ্ঞানের শিক্ষা দিই, এরপর আর কি বা চাই তোমাদের। তোমাদের আমি রাজাদেরও রাজা, রাজ-কুমারদের থেকেও বড় রাজ-কুমার বানিয়ে দিই।" রাজকুমার এবং রাজকুমারীরাও তো মন্দিরে যায়। যারা বিকারী রাজকুমার হয় তাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের মতন নির্বকারী রাজকুমারকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা করতে হয়। কিন্তু আমি তো তোমাদেরকে রাজকুমারেরও রাজকুমার বানিয়ে দিই। তাই শ্রীকৃষ্ণের মতন স্বর্গের রাজ-কুমারই পরিণত হও। জ্ঞানের পাঠের দ্বারাই তো তা হতে পারবে। যেমন ডাক্তার বা ব্যারিস্টারেরা তাদের ছাত্রদের বলে থাকে, আমরাই তোমাদেরকে ডাক্তার বা ব্যারিস্টার তৈরী করছি। কিন্তু ভালো মতন পড়াশুনা করলে তবেই তো তা হতে পারবে। বাবাও তেমনি বলছেন যে বাচ্চারা, তোমরা এটা তো খুব ভালো মতনই বুঝতে পারছো, এই রাজযোগ শেখাচ্ছেন, সেই এক ও একমাত্র পরম-পিতা ভগবান। অবশ্যই কৃষ্ণ নয়। *রাধা আর কৃষ্ণ কিন্তু দুটো পৃথক রাজ-ঘরানার সন্তান । তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়, বিয়ের পর নামের পরিবর্তন হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হিসাবে পরিচিত হন। চিত্রে তাই লক্ষ্মী-নারায়ণের নীচে রাধা-কৃষ্ণকেও দেখানো হয়।

এখন বাবা খুব সুন্দর ভাবে বোঝান যে, এই ব্রহ্মাও ভক্তি-মার্গে এক নম্বর ভক্ত ছিলেন। আগে উনি নারায়ণের পুজা করতেন। কৃষ্ণকে ভক্তি করা বা নারায়ণকে ভক্তি করা, ব্যাপারটা তো একই। যেহেতু কৃষ্ণই পরিণত বয়সে নারায়ণ হন। তাই এখন তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাবার লক্ষ্যে এই রাজ-যোগ শেখানো হচ্ছে। যেহেতু এই জন্মেই তোমাদের ৮৪-জন্মের চক্র পুরো হয়ে

যাবে। আর এনার (ব্রহ্মার) আত্মাও এখন সেই পাঠই পড়ছে, আবার আগামীতে কৃষ্ণ হওয়ার লক্ষ্যে। বাবা বলেন-- বাচ্চারা তোমরা জ্ঞান-চিতায় বসে নির্মল- উজ্জ্বল হয়ে যাও, কিন্তু যদি আবার কাম-চিতায় বসে কালো হয়ে গেছ । তাই একে কংসপুরী বলা হয়। তাই তো বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে কৃষ্ণপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ .....। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতে কেউই সর্বগুণ সম্পন্ন নয়। বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানাতে। কিন্তু তা হতে হবে যোগ-বলের দ্বারা। বাহুবল তো হিংসার লড়াই। যা তীর-কামানের সাহায্যে হয়। পরে যা বন্দুক-তলোয়ালের সাহায্যে হয়। আর বর্তমানে তা হচ্ছে বোমার সাহায্যে। এরা নিজেরাই আবার ঘোষণা করে, এরকম বোম তারা বানাতে পারে, যা নাকি ঘরে বসেই সব কিছু শেষ করা যায়। তখন মিলিটারী আর কি করতে পারবে । বাবা তাই বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এটা তোমাদের পাঠশালা। এখানে *আমি তোমাদেরকে রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের মতন করেই তৈরী করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার ছিলেন। সে-ই আবার ৮৪ বার জন্ম নিতে নিতে কলিযুগে তার ভিখারীর দৈন্যদশা। এই ভারত-ভূমিতেই তার রাজ্যপাট ছিল। এরপর পুনর্জন্মে নিতে হয় তাকে। কৃষ্ণ যদি ভগবানই হত, তবে তো আর তার পুনর্জন্ম হতই না। যেহেতু ভগবান হলেন নিরাকার। উনিই হলেন এক ও একমাত্র রচয়িতা। বাকী সব হল রচনা। তবেই তো আমরা বলতে পারি আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই । সেটাই বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই-বোন। সেখানে অপরাধমূলক দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে আসবে, যেখানে তোমরা ভবিষ্যতের লক্ষ্যে একই বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। পবিত্রতা রক্ষা না করতে পারলে, শান্তিধাম, সুখধামে যাবেই বা কি করে । তোমরাই তো কান্নাকাটি করে জানিয়েছিলে, আমরা পতিত হয়ে পড়েছি, বাবা এসো, আমাদেরকে পবিত্র বানাও। তখন বাবা তোমাদেরকে জানান--"আমাকেই স্মরণ করো, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। তোমাদের সব আত্মাদেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা অর্থাৎ বাণপ্রস্থী। কোনো গুরুই কিন্তু এরকম দিশা দেখাতে পারবে না। এই জ্ঞান একমাত্র এই এক বাবার কাছেই আছে। যিনি পতিত-পাবন নিরাকার। বাবা বার বার বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো, কিছু সময়ের জন্য আমিও এঁনার (ব্রহ্মার) শরীরকে আধার করেছি। শরীর ছাড়া আত্মা কথাই বা বলবে কিভাবে! ভগবানুবাচ হল-- আমি সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করে, তোমাদের বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াই। আমি কোনও গর্ভের মাধ্যমে আসি না অবশ্যই। পুনর্জন্মে যারা আসে, তারাই গর্ভে প্রবেশ করে। (প্রতি কল্পের সঙ্গমে) আমি তো একবারই আসি এই দুনিয়ায়। প্রকৃতির(শরীর) আধার তো আমার অবশ্যই প্রয়োজন। ওঁনার (ব্রহ্মা) শরীরকে আধার করেই, আমি তোমাদেরকে পাঠ পড়াই। ইনি (ব্রহ্মা)তো আগে নিজের হীরে-জহরত ব্যবসা করতেন। কোনো গুরু ওঁনাকে এসব কিছুই শেখাননি - হঠাৎ-ই (শিব) বাবা ওঁনার শরীরে প্রবেশ করেন। ভগবান শিব হলেন 'করণকরাবানহার', সেই কারণে এঁনাকে(ব্রহ্মা-বাবাকে) দিয়ে কর্ম-কর্তব্য করিয়ে নেন। আর ব্রহ্মা-বাবাও তা শিখতে থাকেন। একই সাথে তোমরাও তা শিখতে থাকো। শিববাবা তোমাদেরকে বলেন, কিন্তু সবার আগে আমি (ব্রহ্মাবাবা) তা শুনতে পাই। শিববাবা বাচ্চাদেরকে যখন পড়াতে আসেন, তখন ব্রহ্মাবাবার আত্মাও সেই পাঠ পড়তে থাকেন। আমি বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি । এই পাঠ জাগতিক কেউ পড়ায় না। যা হল পবিত্র হওয়ার পাঠ। কল্পের এই সঙ্গমযুগ-ই পুরুষোত্তম হবার সময়। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম ছিলেন। *যদিও স্বয়ম্বরের পরে তাঁর ডিগ্রী সামাণ্য কম হয়ে যায়। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বেশী । *ওঁনার নামে স্বর্গের নামকরণও করা হয় কৃষ্ণপুরী। আর বর্তমান দুনিয়াটা হল কংসপুরী। কিন্তু, কংসের সাথে কৃষ্ণের গল্প-গাথা সব লোকেদের বানানো।

বাচ্চারা তোমাদের তো বোঝানোই হয়েছে, পরিপক্ক (mature) অবস্থায় এলে, ভক্তিমার্গ থেকে মন আপনা থেকেই সরে যায়। তোমরা কাউকে এমনটা কখনোই বলবে না যে, ভক্তি করো না। কিন্তু তাকে জ্ঞানের কথা বলবে । বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞান দান করে স্বর্গ-রাজ্যের রাজকুমার বানাতে। কৃষ্ণও একদা স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, অবশ্য এখন আর তা নেই। আবার উনি রাজযোগের সাহায্যে তা হতে চলেছেন। তোমাদেরকেও পুরুষার্থের দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনার কাজ শুরু করতে চলেছেন স্বর্গীয় পিতা(Heavenly God Father)। উনি এসেই আবার নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। আর তা করেন, যখন কলিযুগের সময়কাল সম্পূর্ণ হয়, তখন। সত্যযুগ-ত্রেতাতে উনি আসেন না। উনি নিজেই তা বলেন-- প্রতি কল্পের কেবল সঙ্গমযুগেই উনি আসেন। কিন্তু জাগতিক লোকেরা তো সেই কল্প-কল্প শব্দটিকেই বাদ দিয়ে বলে, যুগে যুগে। তাও তো চারটি যুগ-ই হচ্ছে। পঞ্চমটি হচ্ছে সঙ্গমযুগ। আচ্ছা, সে হিসেবে তাঁর পাঁচ-জন অবতারকে মানো। অথচ সেখানে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, পরশুরাম(রাম আর কুঠার)-- এরা কি অবতার হতে পারে। এসব কেবল শাস্ত্রের কথা। এমন কি ধর্মের নাম, ভারতের নামও বদলে দিয়েছে। যাকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুস্থান নামকরণ করা হয়েছে। ভারতের নাম কেনই বা বদল হবে-- যেখানে গীতায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে- "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"। তাতেও ভারত শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা তো কেবল মাত্র এই এক জন্মেই ভক্তি করছো না-সেই দ্বাপর থেকে তা শুরু হয়েছে। *এই ভক্তি-মার্গও শুরুর দিকে অব্যভিচারী ছিল, যা কেবল শিবের উদ্দেশ্যেই ভক্তি করা হতো। যেই শিববাবা ভারতেই স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন। এখন আবার উনি এসেছেন, তোমাদেরকে স্বর্গের অধিকারী বানাতে। তাই এই পতিত শরীরের আধারে থেকেই বলেন যে--"আমি এই পতিত শরীরেই আসি, এই পতিত দুনিয়ার পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। ভক্তি-মার্গের ভক্তরা আমার উদ্দেশ্যে বিশাল বড় বড় মন্দিরও বানায় । এটা তো খুবই সরল কথা। ব্রহ্মার শরীরে শিববাবার প্রবেশ হতেই, তিনি গীতা ইত্যাদি পাঠও ছেড়ে দেন। ভক্তি একেবারেই ছেড়েই দিয়েছেন। অনায়াসেই তা ছেড়েছেন। *তোমাদেরকে কেউ ভক্তি করতে বারণ করছে না। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, আবার করে তোমাদের আমি কৃষ্ণপুরীর অধিকারী হিসাবে তৈরী করছি। তারপর কৃষ্ণের ৮ রাজ্যপাট চলবে। প্রথমে যিনি হবেন তাকে বলে সত্যযুগের রাজকুমার, এরপরে উনি হন সত্যযুগের রাজা। এইভাবে ওঁনারই ৮ প্রজন্ম চলবে। ঐ সময়কালে অন্য আর দ্বিতীয় কোনও কুলের রাজ্য শাসন থাকে না। এখন বাবা বলেন-- বাচ্চারা তোমরাও সেইরূপ সত্যযুগের রাজপুত্র হও। ভক্তির দ্বারা কোন সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারো। কারও পিতার মৃত্যু হলে, তার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, তোমার পিতা কোথায় গেছেন - সে উত্তর দেবে, উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন। ভাবে আত্মা আর শরীর দুইই স্বর্গে গেছে। কিন্তু শরীর তো এখানেই ত্যাগ করতে হয়। বাকী থাকল আত্মা। এর অর্থ তো তবে এমনটাই দাঁড়াচ্ছে যে, এতদিন তবে নরকেই ছিল। আত্মা শরীর ছেড়ে যদি স্বর্গেই যায়, তবে তার জন্য শোক-বিলাপ, কান্নাকাটিরই বা দরকার কি ? বর্তমানে এখানে কোথায় স্বর্গ ? কিন্তু তারা তো তা বুঝবেই না। উপরন্তু বলবে, এ সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছাতেই হয় । সুখ-দুঃখ সবই ঈশ্বরের দান। সব কিছুই ঈশ্বরেরই রূপ। *কিন্তু বাবা বলেন, উনি নিজের বাচ্চাদেরকে কি ভাবেই বা দুঃখ দিতে পারেন। বাচ্চাও কি কখনও বাবার কাছ থেকে দুঃখ চায় ? বরং বাবা তো তার বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত বানিয়ে সম্পদশালী করে যান। এছাড়া দুঃখ তো প্রতেকের যার যার নিজের কর্ম অনুসারে পেয়ে থাকে। *বাবা সতর্ক করে বলছেন, এই সময়ে তোমরা নিজেদের সন্তান ইত্যাদি কোনও কিছুই চেয়ো না । এখনকার এই ধন-সম্পদ সব কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। তবে তখন তোমাদের বাচ্চারা

কি বা পাবে, এতটা সময়ও আর নেই যে তোমাদের সম্পদের অধিকারী তোমাদের বাচ্চারা হতে পারবে। বাচ্চা বড় হলে তবেই না তার অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু ততটা সময় তো আর নেই। মহা বিনাশ যে তোমাদের দোড়-গোড়ায়। জাগতিক দুনিয়ার মানুষ তো প্রচার করছে, কলি-যুগের আয়ু এখনও ৪০ হাজার বর্ষ বাকী আছে। আর এদিকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা তো কেবল বিনাশ বিনাশ করতে থাকে। যেমন গল্প-কথায় আছে না, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে ..... অবশেষে বাঘও এলো, আর তাকে খেয়েও নিল। সবাই ভাবে যে কালের-গ্রাস হয় ধীরে ধীরে। কালের কবলে তো লোকেরা পড়তেই থাকে। কিন্তু তোমরাই বলে থাকো যে মহাকাল তো এসেই গেছে। শিববাবা যিনি কালেরও কাল, তিনি স্বয়ং অবতরণ করেছেন। যিনি সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে শরীরকে ত্যাগ তো করতে হবে অবশ্যই। তাই তো বাবা বার বার বলেন, যোগের দ্বারা নিজেকে পবিত্র-পাবন বানাও। প্রথমে আত্মাদেরকে পবিত্র বানাবো, তারপরেই তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু যারা পবিত্র হবে না, অন্তিমে তাদেরকে ভীষণ সাজা ভুগতে হবে এবং কোনও উচ্চপদের অধিকারী হতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রথম হন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সন্মান(Pass with honours) ও বিশেষ পান্ডিত্যর পুরস্কারও(scholarship) পান। ফল স্বরূপ উনি ২১ জন্মের জন্য রাজ্য- ভাগ্য পান। কত সহজ ভাবেই বাবা তা বুঝিয়ে দেন। এগুলি কি তোমাদের বুদ্ধিতে পাকা হয়েছে, নাকি এখনই তা ভুলে গেছো। কাউকে ভক্তি-মার্গের রাস্তা থেকে সরাবে না। বাবা এসেছেন, ভক্তদের তাদের ভক্তির ফল দিতে। উনি নিজেই তা বলেন, "আমি পূর্ব কল্পের মতন এসে আবার সেই সাধারণ শরীরের আধার গ্রহণ করি। কল্পে কল্পে এসে জ্ঞানের পাঠ পড়াই তোমাদের। যা উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ পাঠ এটা। তোমরা তো জানোই, একদা তোমরাই কত সতো-প্রধান অবস্থায় ছিলে। কিন্তু, এখন তমোপ্রধান অবস্থায়। আবার এই ভারতই সতোপ্রধান হবে। অন্য সব ধর্মাবলম্বীরা এত সুখ কখনও দেখেইনি এবং এত দুঃখও দেখেনি। বাইরের লোকেদের কাছে পয়সা-কড়ি তো অনেকই আছে। তাই তারা গরীব দেশ-গুলিকে ধারও দিতে পারে। তারা তো এসব বিচার করে দেখেই না যে, এটা তারা এখন সব ফেরত দিচ্ছে । একে-বারেই নিশীথ অন্ধকারে কুম্ভকর্ণের ঘুমের মতন শুয়ে আছে । পরে তারাই হায়-হায় করবে। অগত্যা তোমাদের বলতে হবে, অনেক দেরী হয়ে গেছে, কারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন আর করার কি বা থাকবে। দাবানল লাগলে তো আর কিছু করারই থাকে না, তখন অনেক দেরীই হয়ে যায়। সামলানোই যায় না। তাই তো বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এখন তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করতে থাকো। বাবা বেশী কষ্ট দেন না। কেউ কেউ এসে আবার বাবাকে বলে যে, বাবা আমি পূজা-অর্চনা করি না বলে অন্যেরা বলে আমি নাস্তিক হয়ে গেছি। *বাবা তাতে রায় দেন, সাক্ষী-ভাবে বাবার স্মরণে থাকো। লোক দেখানো একটু-আধটু পুজা-অর্চনা না হয় করলেই। একটা হয় অন্তর থেকে করা, আর এক হল, অন্যদের খুশী রাখার জন্য । মনে মনে অন্তরেই তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। কিন্তু কেউ যদি বিরক্ত করে, তখন তাকে দেখাও যে, তোমরা পুজা-অর্চনাও করো। ফলে সেও খুশী হয়ে যাবে। এটা কোনো পাপ কাজ নয়। বাবা তো অনেককেই এমনও বলেন যে, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও যাও। দু-দিকের সম্পর্কই বজায় রাখতে হবে। সেখানেও জ্ঞানের কথা শোনাতে শোনাতে, কারও না কারও তীরও লেগে যাবে। যুক্তি সহকারে চলতে হবে। বাবার আদেশ হল, এরপর আর পতিত হওয়া চলবে না। পবিত্র হতে পারলেই, তোমরা কৃষ্ণ-পুরীর অধিকারী হতে পারবে। শিববাবকে স্মরণ করলে তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বিশ্বের অধিকারী হতে পারবে। বাচ্চারা, এই ধরণের যুক্তিগুলি নিজেদের, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের বোঝাতে হবে। ওরা যে যাত্রা করে, তা হল জাগতিক তীর্থ-যাত্রা। কিন্তু, তোমাদের যে যাত্রা - তা তো আধ্যাত্মিক(রুহানী) যাত্রা। আর সেই রুহানী তীর্থ-

যাত্রার পথ প্রদর্শক হলেন স্বয়ং বাবা। তাই তো উনি বলেন-- একমাত্র আমাকেই স্মরণ করলে, পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে, ফলে সব দুঃখই দূর হয়ে যাবে। কদাচিৎ কোনো ব্যবসায়ী যদি এই সওদা করতে পারে তবেই সে বৈকুন্ঠের বাদশাহী নিতে পারবে। তাই শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, এমন না হয় যে , টাকাপয়সা বৃথাই নষ্ট হল, কিন্তু কোনো ফল এল না । তাই নিজের ঘর-বাড়ীও সামলাতে হবে, বাচ্চাদের লালন-পালনও করতে হবে। কিন্তু সব কিছুই করতে হবে শ্রীমত অনুসারে। প্রয়োজন অনুসারে বাবার রায় নিতে হবে, বাবা এই অবস্থায় আমি কি করবো। কেউ এসে বলে--বাবা, আমার মেয়ে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তখন বাবা বলেন, "তবে তো তাকে বিয়ে দিতেই হবে, তার ভাগের অংশটা তাকে দিয়ে দাও।" বাবা তো কেবল বুঝিয়েই থাকেন, তবুও যদি আরও কিছু জানার থাকে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো। কিন্তু অবশ্যই চলতে হবে শ্রীমত অনুসারে। বাচাদের তো তার বাবার আজ্ঞানুসারেই চলতে হয়। তাতেই যে তাদের কল্যাণ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি, মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সু-প্রভাত। রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের রুহানী বাবা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেক কর্ম করার সময়, সাক্ষী হয়ে শিববাবার স্মরণে থেকেই করতে হবে। লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় দিকেরই সম্পর্ককে বজায় রেখেই চলতে হবে। লৌকিক সমাজে যুক্তি সহকারে চলতে হবে।

২) বর্তমান কল্পের এই শেষ জন্ম আত্মার বাণপ্রস্থ অবস্থা। নিজ গৃহে ফিরতে হবে, তাই পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । কোনও প্রকারের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চলবে না।

বরদান :- প্রত্যেক সংকল্প বা কর্মকে শ্রেষ্ঠ আর সফল বানাবার লক্ষ্যে জ্ঞান-স্বরূপ, বুঝদার (ভব) হও।

যে জ্ঞান-স্বরূপ ও বুঝদার হয়ে, যে কোনও সংকল্প বা কর্ম করে, সে সফলতা মূরত হতে পারে। তারই স্মৃতিতে ভক্তি-মার্গে কোনও কাজ শুরু করার সময় স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয় আর গণেশকে প্রণাম করা হয়। এই স্বস্তিকা স্ব-স্থিতিতে স্থিত হওয়ার আর গণেশ হল জ্ঞানের ভান্ডার স্থিতির সূচক। তোমরা বাচ্চারা যখন নিজে জ্ঞানের ভান্ডারে পরিণত হয়ে, যে কোনও সংকল্প ও কার্য করবে, তখন সহজেই সফলতার অনুভব করতে পারবে ।

স্লোগান :- ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বই হল খুশী। তাই খুশীর দান করতে থাকো।